পারস্পরিক সম্পর্কে গান্ধীজী ও নেতাজী

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

ইং ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগ। ভারত ও সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস তখন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নীতি ও গতি-প্রকৃতি নিয়ে এক চরম মতানৈক্য দেখা দিয়েছে, আন্দোলনের দুই যুগান্তকারী নায়ক গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই বিষয়ে দেশব্যাপী এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে কেবল আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে নয় এবং গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধেও। এই বিতর্ক ও অনৈক্যের মাঝে গান্ধীজীর তার এলো সুভাষচন্দ্রের কাছে "রাজকোট সমস্যা আমাকে বেঁধে রেখেছে, না হলে আমার শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমার কাছে ছুটে যেতাম। আমার কাছে তুমি চলে এসো। নিজ হাতে করে সুস্বাস্থ্য তোমাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিচ্ছি আমি।" প্রায় একই সময়ে, ১৯৩৯ সালের ২০শে এপ্রিল পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লেখা এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখছেন - "গান্ধীজীর জ্বর সম্বন্ধে আমি খুবই চিন্তিত। ভগবান না করুন, এটি যদি চলতে থাকে, তাহলে আমরা কি করব?"

বস্তুতঃ আধুনিক ভারত-ইতিহাসে প্রকৃত charismatic বা প্রবল জনচিত্ত আকর্ষনকারী নেতা বলতে যে দুজন মহামানবের কথা আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে, আমাদের স্বাধীনতা লাভে মৌলিক দান যাঁদের অসামান্য, মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র নামে যাঁরা সমধিক পূজিত, তাঁদের দুজনের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অপূর্ব এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক অথচ মানসিক গঠন, মত ও পথের মৌলিক বৈপরীত্য এক অতি আকর্ষণীয় অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এবং এই সম্পর্ক মনস্তত্ত্বের তথাকথিত ভালোবাসা ও ঘৃণার সম্পর্ক নয়, বিদগ্ধ, স্বাধীনচেতা ও অন্তর-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর দুই মহোত্তম মানুষের স্বাভাবিক ও যথাযথ সম্পর্ক, যার জন্য চরম মতানৈক্যের সময়েও গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে Leader Born বা Patriot of Patriots বলে অভিহিত করতে বা তাঁর দুর্জয় সাহস, রোমাঞ্চকর জীবন, দেশের জন্য অপূর্ব আত্মত্যাগকে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসা করতে বা 'সুভাষ আমার পুত্র' বলে অভিহিত করতে কোন দ্বিধা হয়নি বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কর্তব্য নির্ধারণে আহুত সভায় সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণে অন্যান্য নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে গান্ধীজীর কোন দ্বিধা হয়নি, যদিও সুভাষচন্দ্র তখন নিজ দল গঠন করেছেন, কারণ তাঁর মতে দেশের প্রয়োজনে সুভাষের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিই সুভাষচন্দ্ররেও গান্ধীজীকে মহোত্তম মানুষ হিসাবে স্বীকার করতে ও 'জাতির পিতা' বলে অভিহিত করতে, মানবতার স্বার্থে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করতে এবং ইতিহাস সৃষ্টির চরম মুহূর্তে তাঁর আশীর্বাদ চাইতে কোনরকম দ্বিধা বা কুণ্ঠা দেখা দেয় নি। সত্যসত্যই এক ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যে ভরপুর ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

অনেকেই গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বিরোধের সুত্র খুঁজেছেন। কিন্তু উভয়ের অন্তরের অন্তরস্থলে যে মিলনের ফল্গুধারা প্রবাহিত হত তা কি কম বাস্তব? অমার মনে হয় উভয়েই রাজনীতিতে এসেছিলেন প্রয়োজনের কারণে। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন যে ব্রিটিশ শাসন তাঁর স্বপ্নের স্বরাজ স্থাপনে অন্তরায় স্বরূপ হয়েছিল বলেই গান্ধীজী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন আর ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই এক স্মরণীয় বেতার বক্তৃতায় নেতাজী বলছেন যে, যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হবে তাঁরা অনেকেই রাজনীতির ক্ষেত্র ত্যাগ করবেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্যই তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা, কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগ। বস্তুতঃ উভয়েই দেশমাতৃকার শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও দেশের মানুষের দুর্দশায় গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন ও তা দূরীকরণে সর্বস্ব পণ করেছিলেন এবং উভয়কেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গভীরভাবে আকৃষ্ট ও পুষ্ট করেছিল এবং ভারতীয় সভ্যতার যে মর্মবাণী আধ্যাতিক মূল্যবোধ এবং প্রেমের মধ্যেই মূলতঃ যার প্রকাশ তা তাঁদের অনুপ্রাণিত ও কর্মে উজ্জীবিত করেছিল। গান্ধীজী লিখছেন যে ইতিহাসের গতি ক্রমশঃই অহিংসা বা প্রেমের শক্তি। সুভাষচন্দ্র লিখছেন, "প্রেমই বিশ্বলোকের সারমর্ম এবং জীবনের পরম আদর্শ।" - ভারতীয় সভ্যতার এই মর্মবাণীই গান্ধীজী-নেতাজী উভয়কেই গড়বাদী কোনো আদর্শে বিশ্বাস করাতে পারেনি বরং জীবনের সর্বস্তরে সমতার আদর্শ ও স্বাধীনতাকে পরিব্যস্ত করতে চেয়েছে। সুভাষচন্দ্র লিখছেন, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা।" গান্ধীজী বলছেন, "আমি সেই ভারতের জন্য কাজ করে যাব যে ভারতে দীনতম ব্যক্তিও মনে করবে যে এই দেশ তারই দেশ ও তা গড়ে তুলতে তার অভিমতও কার্যকরী হবে এবং উচ্চনীচ বলে সেখানে কেউ থাকবে না।" এবং এই স্বাধীনতা চরম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেই আসবে বলে উভয়েই স্বীকার করেছেন। গান্ধীজী বলেছেন যে এ হল সে সমাজ যা জাতির শ্রেষ্ঠ রক্তদানের দ্বারা অর্জন করে নিতে হয় এবং সুভাষচন্দ্র নিজ জীবন দিয়ে সেই রক্তদান করে আমাদের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করেছেন।

মিলনের চিত্র কিন্তু গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের মত ও পথ একই কার্যধারার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না। প্রকৃত পক্ষে দুজনের মানসিক গঠনের মধ্যেও মৌলিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজী নিজেই সুভাষচন্দ্রকে লিখিত ১৯৩৯ সালের ২রা এপ্রিল তারিখের পত্রে

তাঁদের মধ্যে তীক্ষ্ণ মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন যে শুভাষের পথ তাঁর নয়। মূলতঃ গান্ধী ছিলেন সত্যের পূজারী এবং সেই জন্য ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর চরম লক্ষ্য ছিল না, দেশ ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজকে সর্বপ্রকার দাসত্ব ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। যে কোন মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা তিনি চাননি ও তাঁর এই মনোভাবটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। সেই জন্য গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের মতদ্বৈধতা যখন চরমে, বাঙালী কবি হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক রূপে বরণ করতে গিয়ে তিনি বলছেন, "বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্য দানের উদ্দেশ্য মহাত্মাজীর মনে একটি বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে।" স্বদেশকে এই স্বাতন্ত্র্য দান হল দেশ-প্রীতিকে ছাড়িয়ে মানব প্রীতিতে তার উত্তোরণ, অন্যায়ের চরম বিরোধিতার পরেই পরম প্রেমের সম্মেলন। গান্ধীজীর অহিংসার প্রতি বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা, লক্ষ্যের চেয়ে উপায়ের প্রতি ঝোঁক, ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি অত্যন্ত dynamic বা বেগবান, যৌবনদ্দীপ্ত, আত্মপ্রত্যয়ী, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলা বদ্ধতায় বিচলিত সুভাষচন্দ্রের কাছে আদৌ আবেদন করেনি, কারণ তাঁর কাছে সর্বোচ্চ চিন্তা ছিল দেশের স্বাধীনতা। তিনি লিখছেন - এই জগতে সব বিনাশ হয়ে যায়, যাবেও। কিন্তু বিনাশ নেই স্বপ্ন, আদর্শ ও মনীষার। - আজ আমি প্রাণ অর্পণ করব যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে, পেতে পারে গৌরবময় মুক্তি। "এর জন্য প্রয়োজনে জনবলের সঙ্গে তারই ভাষায় কথা বলতে ও মোকাবিলা করতে হবে, কার্যোদ্ধারের জন্য প্রয়োজনে শত্রুর শত্রু পরম মিত্রেও পরিণত হবে।" সুভাষচন্দ্র কি অত্যন্ত আবেগ প্রবণ ছিলেন? সেই জন্যই কি গান্ধীচিন্তার প্রকৃত import বা মর্মার্থ উপলব্ধি করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন?

১৯৩৩ সালে ভিয়েনা থেকে বিবৃতি বা ১৯৩৯ সালে চরম মতবিরোধ সেই মানসিকতারই কি বহিঃপ্রকাশ - অন্ততঃ ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের কথোপকথন সেই ইঙ্গিতই কি বহন করে? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এর কয়েক বছরের মধ্যেই কি চরম আন্দোলনে গান্ধীজী ঝাঁপিয়ে পড়েন নি? তখনই কি যোগ্য মুহুর্তটি এসে গেছিল? গান্ধীজীর কথাতেই জানা যায় তাঁর এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কোন্ চিন্তা কাজ করেছে। তিনি বলছেন - "ইংরাজদের যাওয়া দরকার কারণ বিশ্বযুদ্ধে প্রকৃত অত্যাচারিত দুইটি দেশ, চীন ও রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। আমার মানপ্রীতিই আমাকে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেবল ভারতই এখন আমার সামনে নেই, কুয়োর ব্যাঙের ভূমিকা আমি কোনদিনই পালন করতে চাইনি।"

বস্তুতঃ স্বাভাবিকভাবেই গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের অন্তিম পথ ভিন্ন হয়েছে। আধুনিক ভারত ইতিহাসের এটি কি একটি ট্রাজেডী? প্রকারন্তরে এইটিও কি সেই ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর, গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি?

গান্ধীজী ও নেতাজী উভয়েই আজ ইতিহাস পুরুষ। গান্ধীজী বলেছেন নেতাজীর নাম জাদুমন্ত্রের মত। আর গান্ধীজী? মানব-সভ্যতা যদি স্বাধীনতা, সত্য ও শোভনতায় প্রস্ফুটিত হতে চায় তাহলে বর্তমান শতাব্দী ও তার পরে যা আছে তাকে গান্ধী নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হতে হবে।